

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাহ্নাতুল ফিরদাউস

রোলঃ ২১৫০০১১৯২

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাম্নাতুল ফিরদাউস
রোলঃ ২১৫০০১১৯২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফিরদাউস, আইডিঃ ২১৫০০১১৯২ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জাম্নাতুল ফিরদাউস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

জাম্নাতুল ফিরদাউস

আইডিঃ ২১৫০০১১৯২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.তাকওয়ার পরিচয়	৬
৩.তাকওয়ার গুরুত্ব	৬
৪.তাকওয়ার হকুম	৭
৫.তাকওয়ার স্তর	৮
৬.তাকওয়া অর্জনের উপায়	৯
৭. কুরআনের আলোকে তাকওয়া	১১
৮. হাদিসের আলোকে তাকওয়া	১৫
৯.সাহাবীদের তাকওয়ার নমুনা	১৭
১০.সাংসারিক জীবনে তাকওয়া	২০
১১.রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাকওয়া	২২
১২. ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাকওয়া	২৩
১৩. চাকুরী ক্ষেত্রে তাকওয়া	২৫
১৪.তাকওয়ার ফজিলত	২৬
১৫.তাকওয়ার পুরস্কার জান্নাত	২৭
১৬.নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব	২৯
১৭.তাকওয়া মুমিনের সম্বল	৩০
১৮. উপসংহার	৩০

ভূমিকা

তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল ভিত্তি। এটা আল্লাহর নিকটে মানুষ কে মর্যাদাবান করে তোলে। তাক্বওয়া ছাড়া দ্বীনের প্রতি অটল থাকা কখনোই সম্ভব না। একজন দ্বীনদার ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাক্বওয়াবান হওয়া। তাক্বওয়া অবলম্বন করা। ব্যক্তি জীবনে তার কাজ কর্ম আচার-আচরন ব্যবহারের মাধ্যমেই তাক্বওয়ার প্রভাব ফুয়ে ওঠে। আল্লাহ ভীতি না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, যেমন টা করে পশু-পাখি। একমাত্র আল্লাহ ভীতি তাক্বওয়া অবলম্বনের ফলেই মানুষ হয়ে ওঠে সৃষ্টির সেরা। একজন তাক্বওয়াবান ব্যক্তি প্রতিটা কাজ করে ভেবে চিনতে 'আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্য নিয়ে। কেননা তাক্বওয়া অবলম্বন করে চললে ইহকাল পরোকাল দুইকালেই শান্তিতে থাকা সম্ভব হবে।

প্রতিটা মানুষের উচিত তাক্বওয়ার বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা। আল্লাহকে ভয় করে চলার ফজিলত জানা। জান্নাত-জাহান্নাম এর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বহু নির্দেশ এসেছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী জীবনকে সাজাতে হবে “তাক্বওয়ার রঙে”।

তাক্বওয়ার পরিচয়

তাক্বওয়ার মানে হলো আল্লাহর ভয় বা ভীতি। ইহা একটি আরবি শব্দ। পবিত্র আল কুরআনের বহু জায়গায় এই শব্দটি পাওয়া যায়। তাক্বওয়া: (تقوى) শব্দের অর্থ

বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা। ব্যবহারিক অর্থে দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি, আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বোঝায়।

ইসলামি পরিভাষায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাক্বওয়া। অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম

থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই হচ্ছে তাকওয়া।

তাকওয়ার "প্রমাণ" হল আল্লাহর "ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতা", যা "একজন ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক থাকতে অনুপ্রাণিত করে" এবং আল্লাহকে খুশি করে এমন কাজ করতে আগ্রহী করে।

তাকওয়ার আক্ষরিক অর্থ এটা বোঝায় যে, "রক্ষা করা"। সাধারণভাবে, নিজেকে "আল্লাহর ক্রোধ থেকে" রক্ষা করার জন্য "আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত না হওয়া"। যা আদেশ করেছেন, সেরকম চলতে সদা চেষ্টা করা।

তাকওয়ার গুরুত্ব

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তায়ালা নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তায়ালা নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ তায়ালা নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।” (সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ৪)

পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আল্লাহ তায়ালা বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন । আল্লাহ তায়ালা তাকওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন । বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন ও বরকতময় রিযিক দান করেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।” (সূরা আত্-তালাক, আয়াত ২-৩)

পরকালেও তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার । আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুমিনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (আল্লাহকে ভয় কর) তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়- অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন । আর আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময় ।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ২৯)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, অর্থ : “নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা ।” (সূরা আন্-নাবা, আয়াত ৩১)

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে ।

তাকওয়ার হুকুম

আল্লাহ যা নিষেধ হুকুম করেছেন সে সব সকল বিষয় থেকেই মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার হুকুম ফরজ। তাকওয়া একটি ফরজ বিধান। আল্লাহর ভয় ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাত লাভ করতে পারবে না। আল্লাহকে ভয় পাওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয়। পবিত্র কুরআনে এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা তাঁর সাথে

এমন পন্থায় সম্পর্ক স্থাপন কর যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। যার পরিণাম কল্যাণকর। কল্যাণকর পরিণাম জান্নাত ছাড়া আর কিই বা হতে পারে।

তাক্বওয়ার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

যে কাজ শুরু হবে একনিষ্ঠ ঈমানের সাথে এবং শেষ হবে আল্লাহর সওয়াব ও আল্লাহর খুশির প্রত্যাশায় সেটাই আনুগত্য ও পূণ্যের কাজ বলে গন্য হবে। আর এটাই হচ্ছে তাক্বওয়ার হক্কীকত। এটাই তাক্বওয়ার হুকুম।

তাক্বওয়ার স্তর

তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন ও তার নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিহার করা। তাক্বওয়ার কিছু স্তর রয়েছে। তাক্বওয়ার স্তর হচ্ছে তিনটি। তাক্বওয়ার স্তর সমূহ সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. প্রথম স্তর: কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা তাক্বওয়ার প্রথম স্তর। শিরক ও কুফর থেকে বেচে থাকার মাধ্যমে চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।
২. দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহ ও তার আল্লাহর রাসূলের সকল অপছন্দনীয় যাবতীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। এমন কি ছোট গুনাহ সগীরাহ থেকেও বেচে থাকতে হবে।
৩. তৃতীয় স্তর: অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছু থেকে বিরত রাখা। আল্লাহর অসুন্তুষ্ট বিষয় থেকে সব সময় নিজেকে মুক্ত রাখা। এই স্তরের তাক্বওয়া নবী রাসূল (সা) হয়ে থাকে। আর এটিই তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়া মানে সতর্ক ও সচেতন থাকা। বান্দা সতর্ক থাকবে কিছুতেই যেন গুনাহের কাজ সংঘটিত না হয়; আর নেক আমল কিছুতেই যেন না ছুটে যায়। কিছুতেই যাতে আল্লাহ তা'য়ালার অসুস্তৃষ্টির কারন না হয়ে যায়। সর্ববস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলা। পবিত্রে কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাস্তা তাল্লাশ কর এবং তাঁর রাস্তায় মেহনত কর। যাতে এসব কিছু ফলে তোমাদের সফলতা অর্জিত হয় দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।’ (সূরা : মায়িদা : ৩৫)

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে প্রথমে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরা কুরআন মজীদ তাকওয়ার নির্দেশে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে একটু পরপরই তাকওয়ার নির্দেশ এসেছে। এখন প্রশ্ন হল, তাকওয়া অর্জিত হবে কীভাবে? আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দানের পাশাপাশি তা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

১. সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশের সাথে এসেছে: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

-আর সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ কর।

২. ওসীলা বা মাধ্যম অন্বেষণ। পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

-এবং তার নৈকট্য লাভের ওসীলা (মাধ্যম) তাল্লাশ কর।

উপরোক্ত আলোকে এই বোঝা যায় যে, অধিক পরিমাণে নেক আমল করতে হবে এবং দ্বীনি সাহচর্যদের সাথে থাকতে হবে। নিজেকে নেক আমল করতে হবে এবং যারা সত্যের পথে ছিলো নবী রাসূল (স) গণের দেখানো পথে চলতে হবেম দুনিয়াতেও যারা তাকওয়া অবলম্বন করে সে সকল ব্যক্তিদের সাথে সাহচর্যে থাকতে হবে।

তাকওয়া অর্জনে সুহবত বা সান্নিধ্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের কর্ম, চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে। দ্বীনের অনুসরণের সফলতা এরই

ধারাবাহিকতায় এসেছে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুহবত অবলম্বন করেছিলেন। সাহাবীদের সুহবত তাবিঈগণ এবং তাবিঈগণের সুহবত তাবে তাবিঈগণ অবলম্বন করেছিলেন, যাদের যুগকে তাদের উত্তমতার কারণে সর্বোত্তম যুগের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

তাকওয়া অর্জন করার জন্য আরো কিছু নির্দেশ মতো চলতে হবে যেমন:

১. আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভয় করা।

২. আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে জাগ্রত করা।

৩. সর্বদা মৃত্যু, কবর জীবন তথা পরকালের কথা স্মরণের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৪. আল্লাহর নিকট এর জন্য প্রার্থনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শঃ এ দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَرَزَقَهَا أَنْتَ حَيْرٌ مَنْ رَزَقَهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

-হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তাকওয়ার গুণে গুণাশ্রিত করুন, একে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করুন, আপনি সর্বোত্তম পবিত্রতা দানকারী, আপনি এর মালিক ও নিয়ন্ত্রক।

৫. হারাম বা সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করা এমনকি সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

৬. অনর্থক কথা, কাজ এবং চিন্তা-ফিকির থেকে বেঁচে থাকা।

৭. আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান প্রদর্শন করা।

৮. অন্তরে আল্লাহর মুহব্বত বৃদ্ধি করা ও পার্থিব বিষয়াদির মহব্বত কমানো।

৯. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ আনুগত্য করা।

১০. আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।

১১. আল্লাহ তা'য়ালার কবরের আযাব ও জাহান্নামের ভয়াবহতা জাহান্নামে আগুন সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

১২.গভীর রাতে কিংবা অন্ধকার রুমে একাকী ভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই এভাবে ভাবতে হবে।

১৩.পুরুষরা টাখনুর উপরে এবং মহিলাদের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করতে হবে।
এ সকল বিষয়াবলি তাকওয়া অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

আবার যদি একান্তে বসে মৃত্যুচিন্তা করা, নেক কাজের সওয়াব এবং বদকাজের আযাবের ধ্যান করা, কবরের জগতে আমার কী অবস্থা হবে, হাশরের ময়দানে সকলের সামনে আমার ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে, যখন আল্লাহ পাকের সম্মুখে আমাকে হাজির করা হবে এবং আমলনামা আমার সামনে তুলে ধরা হবে, তখন আমি কী জবাব দেবো? কোথায় মুখ লুকাবো ইত্যাদি চিন্তা করা। কিছু দিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকওয়া নসীব হবে আল্লাহ চাইলে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাকওয়া নসীব করুন।।

কুরআনের আলোকে তাকওয়া

পবিত্র কুরআন মাজীদে তাকওয়ার কথা অনেক বার বলা হয়েছে। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একজন তাকওয়া বান মানুষ আল্লাহর নিকট অত্যাধিক প্রিয় হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘ নিশ্চয়ই আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি। যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে বক্রতামুক্ত আরবি কোরআন। যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।’
(সূরা যুমার : ২৭-২৮)

আল্লাহতায়ালা যদি কোরআন নাজিল না করতেন, তাহলে আমরা জানতে পারতাম না, কিভাবে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করব। আল্লাহতায়ালায় পরিচয় লাভ করার অনন্য এক মাধ্যম হলো, পবিত্র কোরআন। কোনো মানুষ যখন পবিত্র কোরআন নিয়ে অভিনিবেশসহ চিন্তা করে, তখন আল্লাহতায়ালা তাঁর শান-শওকত, মহত্ব, গুণবাচক নামসমূহ ও গুণাবলির মাধ্যমে তার সামনে প্রকাশ হন। ইমাম ইবনে কাইয়ুম (রহ.)

বলেন, ‘কোরআন আল্লাহর কলাম। আর আল্লাহ তাতে তার গুণাবলির মাধ্যমে বান্দার সামনে আবির্ভাব হন।’ (ফাওয়াইদ : ৮০)।

কোরআন মাজিদে মুমিনের যেসব বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার মধ্যে “তাকওয়া” অন্যতম। কারণ “তাকওয়া বা আল্লাহভীতি” মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অর্জন ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিন কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই তো অসংখ্য আয়াতে গুনাহ মাকের সুসংবাদ, দোয়া কবুল, পরকালের সফলতা, রিজিকে বরকত দানসহ কোরআন মাজিদে এ বিষয়ে অনেক সুসংবাদ এসেছে।

তাকওয়ার সুফল সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো যেমন:

জান্নাত ও সাহায্য লাভ

যাদের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথায় কোনো পরিবর্তন হয় না।

এটাই হলো মহা সফলতা। (সূরা ইউনুস আয়াত : ৬৩-৬৪)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সঙ্গে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

(সূরা নাহল, আয়াত : ১২৮)

ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান

যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে মহাপ্রতিদান দান করেন।

’(সূরা তালাক, আয়াত : ৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।’ (সুরা আনফাল, আয়াত : ২৯)

আর্থিক সচ্ছলতা ও নিশ্চিন্ত জীবন

তাকওয়া অবলম্বনে দুনিয়াবি একটি সুফল হলো, মুমিনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ সহজ করে দেন এবং আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন।’ (সুরা তালাক, আয়াত : ৪)

আর্থিক সচ্ছলতা বিষয়ে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।’

(সুরা তালাক, আয়াত : ৩)

পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি ও সফলতার সুসংবাদ

এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘অতঃপর আমি মুত্তাকিদের মুক্তি দেব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।’ (সুরা মারিয়াম, আয়াত : ৭২)

আর মুত্তাকিদের সফলতার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, ‘পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য।’ (সুরা নাবা, আয়াত : ৩১)

আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার সুসংবাদ

কোরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকিদের ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তবে যে মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে

সাহায্যও করেনি, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের পছন্দ করেন।' (সূরা তাওবা, আয়াত : ৪)

আর সৎ কর্মের মধ্যে রয়েছে তাকওয়া। ইরশাদ হয়েছে, 'অবশ্য নেকি হলো আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৯)

সৎ কাজের যথাযথ প্রতিদান

নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সে রূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯০)

অফুরন্ত নিয়ামত ও নিরাপদ স্থান লাভ

যেসব মুমিন আল্লাহকে যথাযথ ভয় করবে আল্লাহ তাদের অফুরন্ত নিয়ামত ও নিরাপদ স্থানে থাকার সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই পরহেজগাররা (জান্নাতে) উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহে থাকবে।' (সূরা হিজর, আয়াত: ৪৫)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা নিরাপদ স্থানে থাকবে।' (সূরা দুখান, আয়াত : ৫১)

পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ - 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড দান করবেন। তোমাদের পাপ মিটিয়ে দিবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল' (আনফাল ২৯)।

অত্র আয়াতে চারটি জিনিসের কথা বলেছেন-

- (১) পরহেযগার হতে বলেছেন
- (২) বিনিময়ে আল্লাহ মানদণ্ড দিবেন
- (৩) পাপ মিটিয়ে দিবেন

(৪) ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্‌ভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। আর তাকওয়া মানুষের জীবিকার গ্যারান্টি হতে পারে।

মানুষ তার বংশ মর্যাদা দ্বারা সম্মান লাভ করতে পারে না। কেবল তাকওয়া দ্বারা ইয্যত-সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ (যে লোক আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন' (তালাক ৪)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۚ (যে লোক পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার পাপ মিটিয়ে দেন এবং তাকে বড় প্রতিদান প্রদান করেন' (তালাক ৫)।

হাদিসের আলোকে তাকওয়া

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খোদাভীতি, হরহেযগারী, বিরত থাকা, আত্মশুদ্ধি। আর শরীয়াতের পরিভাষায়- আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলার নাম তাকওয়া।

হাদিসেও তাকওয়া সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে। তাকওয়া সম্পর্কে আমরা যে সকল হাদিস দেখতে পাই,

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আয়েশা। ছোটখাট গুণাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“দুনিয়াটা অবশ্যই সুমিষ্ট ও চাকচিক্যময়। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চান তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই (তোমরা) দুনিয়াকে ভয় করো এবং নারীদের (ফিতনা) কেও ভয় করো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।”

(মুসলিম)

[রিয়াদুস সলিহীন—৭০]

**হযরত ইবন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও স্বনির্ভরতা কামনা করছি।”(মুসলিম)

[রিয়াদুস সলিহীন—৭১]

***হযরত আবু তারিফ ‘আদী ইবনে হাতেম তা’ঈ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর অধিকতর তাকওয়ার কোনো কর্ম দেখলো। এ অবস্থায় সে আল্লাহ্‌ভীতির কাজটি-ই তার করণীয়।” (মুসলিম)

[রিয়াদুস সলিহীন—৭২]

***আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি বিদায় হজ্জের অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভাষণ দিতে শুনেছি, ‘ ’ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

—তিরমিযী ৬১৬, আহমাদ ২১৬৫৭, ২১৭৫৫, (তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

***আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তা'আলাকে তাকওয়া কর (ভয় কর ও মেনে চলো), মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর

—, মিশকাত ৫০৮৩, তিরমিযী ১৯৮৭

সাহাবীদের তাকওয়ার নমুনা

সাহাবী হযরত আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন পরিবারের প্রধান কর্তা । স্ত্রী সুফিয়া (রাঃ) এবং ছোট এক নাবালক ছেলেই হচ্ছে উক্ত পরিবারের অন্য দুই সদস্য । একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ কোন এক প্রয়োজনে হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর জীর্ণ কুঠিরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হলেন । হযরত উমর ও উসমান (রাঃ) এর ন্যায় বড় ‘ বড় সাহাবীও তখন তাঁর সাথে ছিলেন । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর সাথে বেশ কিছুক্ষণ যাবত একটি বিষয় নিয়ে কথা - বার্তা বলছেন । এ সময় তিনি লক্ষ্য করলেন , হযরত উমর (রাঃ) এর চেহারায় অস্থিরতার ছাপ কেন যেন তিনি ছটফট করছেন । কখনও রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন আবার কখনও আবু তালহার জীর্ণ কুঠিরের দিকে এগিয়ে যান । অদম্য আগ্রহ নিয়ে বারবার কি যেন তিনি দেখার চেষ্টা করছেন । এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন -

উমর ! কি হয়েছে তোমার ? এমন করছ কেন ? জবাবে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা এখানে আসার পর থেকেই আবু তালহার ঘর থেকে একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি । এই আওয়াজ আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে । কান্নার এ সুর আমার মত মানুষের কঠিন দিলকেও মোমের মত গলিয়ে

দিচ্ছে । আমার অস্থিরতা ও পেরেশানী শুধু এ জন্যই । হযরত উমরের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হলেন ।

তিনি বললেন , উমর ! বল কি তুমি ! আবু তালহার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে? অতঃপর আবু তালহার দিকে মুখ করে বললেন , আবু তালহা ! দরজা খোল । তিনি দরজা খুলে দিলে ভিতরের দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ কারো মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না । বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন , আবু তালহা! আবু তালহা !! একি দৃশ্য আবু তালহা! নিষ্পাপ এই শিশু বাচ্চাটির কি অপরাধ ছিল? যার জন্য তুমি তাকে শক্ত রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এ প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হলেও সবার মনেই এ প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল । কেউ বুঝতে পারছিল না , কেন আবু তালহা (রাঃ) তাঁর নিষ্পাপ ফুটফুটে বাচ্চাটিকে এভাবে বেঁধে রেখে কষ্ট দিচ্ছে । শিশুটির ব্যথায় ব্যথিত হয়ে চোখের কোনায় উছলে উঠা দু'ফোটা অশ্রু নিয়ে সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আবু তালহা (রাঃ) এর দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন । আবু তালহা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন ,

হুজুর ! অপরাধ মাফ করবেন । আমার ঘরের দরজার সামনে যে খেজুর গাছটি দেখছেন এর মালিক এক ইহুদী । প্রতিদিন এ গাছ থেকে অনেক খেজুর ঝড়ে পড়ে; আর আমার অবুঝ শিশুটি ক্ষুধার তাড়নায় খেজুরগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায় । হে আল্লাহর রাসূল ! হাশরের ময়দানে খোদার দরবারে এজন্য কি জবাব দিব - এই ভয়ে এই অবুঝ শিশুটিকে আমি বেঁধে রেখেছি । আবু তালহার কথা শুনে সকলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল । সকলেই নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সবাই বুঝতে পারলেন— আবু তালহা কোন সাধারণ ব্যক্তি নন , বরং তিনি হচ্ছেন দ্বীনে হকের পথে কুরবান করা এক মর্দে মুজাহিদ । এবার দয়ার সাগর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রাঃ) কে বুকে টেনে নিলেন এবং সাহাবীদের লক্ষ্য করে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন , তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি ? যে ইহুদীর

কাছ থেকে এই খেজুর গাছটি ক্রয় করে আবু তালহাকে হাদিয়া দিবে ? হযরত উসমান (রা :) বললেন , ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি রাযী আছি । একথা বলে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইয়াহুদীর বাড়িতে গেলেন । ঐ সময় ইহুদী একটি কাজে ব্যস্ত ছিল । উসমান (রা :) তাকে সম্বোধন করে বললেন , আগে আমার একটি কথা শুনুন । আমি দয়ার নবীকে দাঁড়িয়ে রেখে এসেছি ।

ঃ কি কথা বলতে চান ? বলুন ।

: আবু তালহার বাড়ির সামনের খেজুর গাছটি কি আপনার ?

: হ্যাঁ !

ঃ উহা বিক্রি করবেন কি ?

ঃ না । : গাছটি আমার খুবই প্রয়োজন ।

: না , উহা আমি বিক্রি করব না । অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর একটি দুটি নয় বরং বিশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে ইহুদী তার গাছটি বিক্রি করতে সম্মত হল । হযরত উসমান (রাঃ) গাছ ক্রয় করে দৌড়ে এসে বললেন , ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গাছটি আমি ক্রয় করেছি । আজ থেকে এই গাছের মালিক হবে আবু তালহা । আমি তাকে উহা হাদিয়া স্বরূপ দান করলাম । একথা শুনে আবু তালহার চক্ষু থেকে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হল । অশ্রুর ঝর্ণা ধারায় তার দাড়ি মোবারক ভিজে গেল । তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন , ইয়া রাসূলুল্লাহ ! উসমান (রাঃ) -এর কাছে আমি চির ঋণী হয়ে গেলাম । এ দানের প্রতিদান দেবার মত কিছুই নেই আমার

উসমান (রা :) বললেন , ভাই আবু তালহা ! এ দানের কোন প্রতিদান তোমাকে দিতে হবে না । কেয়ামতের দিন যখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হেসে খেলে বেড়াবে তখন একবার আমাকে ভাই বলে পরিচয় দিয়ে তোমার সঙ্গী করে নিও ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁধন খুলে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন । এবার বিদায়ের পালা । তিনি শিশুটিকে আবু তালহার কোলে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে । আবু তালহা (রাঃ) লক্ষ্য করলেন , তার

ছোট নিষ্পাপ শিশুটি আজ দয়ার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের স্নেহাস্পদ হাতে মুক্তি পেয়ে নিরবে তাকিয়ে আছে নবীজীর গমন পথের দিকে । অল্প কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে - সঙ্গীসহ মরুভূমির বুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । আল্লাহর ভয় অন্তরে কি পরিমাণ সৃষ্টি হলে একজন মানুষ নিজ সন্তানের সাথে এরূপ আচরণ করতে পারে ?

বাস্তবিক , খোদাভীতি এমন এক বস্তু , যা অনেক কঠিন কাজকেও সহজ করে দেয় । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন , যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্যা সমাধানের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেন এবং তাদেরকে এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন , যেখান থেকে রিযিক আসবে বলে তারা কল্পনাও করতে পারেনি ।।

সাংসারিক জীবনে তাকওয়া

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন নিয়ামতরাজি দিয়ে ধন্য করেছেন । বরকত হ'ল মহান আল্লাহর নিকট থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তির একটি বিষয় । মানুষ দুনিয়াতে হয় বরকত লাভে ধন্য হয়, নতুবা বরকত শূন্যভাবে জীবনযাপন করে । তেমনি সাংসারিক জীবনেও তাকওয়া অবলম্বন করলে বরকত আসবে অন্যথায় বরকত শূন্য হয়েই কাটাতে হবে ।

তাকওয়ার ছায়াতলেই সকল কল্যাণ, সৌভাগ্য ও বরকতের বসবাস । আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তাকে যথাযথ ভয় করলে তিনি বান্দার প্রতি বরকত বা কল্যাণ দান করেন । আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না (আলে ইমরান ৩/১০২) ।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘যদি জনপদের মানুষগুলো ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের দরজা খুলে দিতাম। কিন্তু তা না করে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের দরুণ’ (আ‘রাফ ৭/৯৬)।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন’ (তালাক ৬৫/২-৩)।

যখনই একজন মানুষ সব হারাম থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং সব বিষয়ে বেশী বেশী আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তা‘আলা ওই বান্দার জন্য আসমান ও যমীনের সব বরকতের দুয়ার খুলে দেন

সাংসারিক জীবনে সমস্যা হবে এটাই স্বাভাবিক। আর তাকওয়াবান ব্যক্তির আল্লাহ কে ভয় করে কেউ কারো প্রতি জুলুম করে না। কেউ কারো দোষ ত্রুটি নিয়ে পড়ে থাকে না। সংসারে একে অন্যের প্রতি আঙুল তোলার আগেও তারা আল্লাহ কে ভয় করে আর চিন্তা করে প্রতি উত্তর দিতে গিয়ে আবার বেশি বলে ফেলাতে আল্লাহ তা‘আলা যাতে পাকড়াও না করেন। এভাবে সংসার এ থাকা প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাকওয়া থাকলে প্রতিটি সংসারে জান্নাতি সুখ বরকত লাভ করা সম্ভব হবে। কাজেই সাংসারিক জীবনে সুখি হতে চাইলে বা সফল হতে চাইলে তাকওয়াবান হতেই হবে।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাকওয়া

তাকওয়ার অর্থ সাবধানে জীবনের পথ চলা। কোথায় পা ফেলছেন তা দেখে পথ চলা। অর্থাৎ জীবনের পথ চলায় ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে চলা, অসৎ কাজ পরিহার করে সৎ পথে চলা। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়া শব্দের মর্ম হলো আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই মাপকাঠি মোতাবেক জীবনের পথে চলা। যারা অমন সাবধানতার সঙ্গে পথ চলেন তাদের বলা হয় মুত্তাকী। তাকওয়া হচ্ছে সাবধানে পথ চলা।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিন জীবনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমাজের অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তাকওয়া অনুশীলন করলেও মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকওয়ার অনুশীলন করেন না। যার অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে অর্থনৈতিক অপরাধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুদ, ঘুষ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, অপচয়, কৃপণতা ও অনৈসলামিক ব্যাংকিং প্রভৃতি অসংখ্য অর্থনৈতিক অপরাধে আমাদের সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতি এ সব অপরাধ প্রবণতা সম্প্রসারণের মূল কারণ। তাকওয়ার ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক জীবনে এর যথাযথ অনুশীলনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সমাজের অধিকাংশ অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অনুশীলনের পথনির্দেশনা দেয়াই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।।

তাকওয়ার এ অগ্রগামিতা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব আরো অনেক গুণ বেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে লেনদেন, আয়-উপার্জন ও ব্যয়-খরচে তথা অর্থনৈতিক জীবনেও তাকওয়া অবলম্বনকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বরং একজন মানুষ প্রকৃত তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার বাস্তব প্রমাণই হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার পরিপূর্ণ অনুশীলন।

ইসলাম একটি পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক জীবন প্রণয়ন করেছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ অর্থনীতি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হবে। কেউ ঘুষ, সুদ, লোক ঠকানো, মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রয়, দ্রব্যমূল্যে দাম বাড়ানোর আগে অবশ্যই আল্লাহ কে ভয় করবে।

সুদী কারবার, ওজনে কম, মওজুদদারী, মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়, ফরমালিনের মত জীবনগ্রাসী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে লাভবান হওয়া, পণ্যের দোষ গোপন, ঘুষ গ্রহণ, ঘুষদান, আত্মসাৎ, যুলম, প্রতারণা, লটারী, ফটকাবাজারী, জাল-জোচ্চুরি, অবৈধ ক্রয়বিক্রয়, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জোর-দখল, ধোঁকা, ডিউটি পালন না করে বেতন গ্রহণ ও যাকাত না দেয়ার মত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধে সমাজ আকর্ষণ নিমজ্জিত হওয়ার পেছনে তাকওয়ার অনুপস্থিতিই মূল কারণ। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তথা তাকওয়ার গুণ অর্জনকারী কক্ষনো এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস দেখায় না। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কটই মানুষকে দ্রুত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কট নিজের খাদ্য, পোশাক এমনকি শরীরকেও হারামের সাথে মিশিয়ে একাকার করে ফেলে। যার পরিণতিতে কবুল হয় না তার ইবাদত। তখন জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাকওয়া এক দুর্লভ সম্পদ, যা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাকওয়া

ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই লাগামহীন স্বাধীনতা দেয় নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের দু'টি মূলনীতি রয়েছে।

এক- ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও কায়কারবারগুলো বৈধ হতে হবে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ও অবৈধ কায়কারবারকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। যেমন, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়া ইসলামে অনুমোদন নেই। কারণ, এসব বিষয়কে ইসলামে মৌলিকভাবেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আপনার ব্যবসার সাথে এসবের সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসাকে কলুষিত করে।

দুই- ব্যবসা-বাণিজ্য সকল অবস্থায় বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি, ভেজাল ও ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় থাকতে পারবে না।

আর এই দুই নীতিমালাই একমাত্র তাকওয়া অবলম্বন করাতেই সম্ভব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَّقَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“অবশ্যই ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন ফাজের হিসেবেই উপস্থিত করা হবে। তবে যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎ কর্ম করে ও সত্য কথা বলে, তাকে ছাড়া” [2]

সততা ও তাকওয়ার সঙ্গে ব্যবসা করলে তা যেমন কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বসাবে, তেমনি এগুলো পরিত্যাগ করলে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠরূপে উঠতে হবে। তাই ব্যবসায় সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করা আবশ্যিক। (তিরমিজি, হাদিস : ১২১০)।

কাজেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাহ উভয় জাহানেই সফলতা পাওয়া সম্ভব।

চাকুরী ক্ষেত্রে তাকওয়া

এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা বান্দা যথাযথভাবে পালন করে না। বরং প্রতিটি কাজে আমরা আল্লাহর অবাধ্য হই। তার বিধানের কথা ভুলে যাই। তার প্রতি আমাদের কোনো ভয় থাকে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল-কুরআনে বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও’ (সূরা আত-তাওবা : ১১৯)।

আল্লাহকে ভয় করা প্রকৃত মুমিন বা ঈমানদারদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী পরিভাষায়, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সব প্রকার কথা, কাজ ও চিন্তা পরিহার করে। কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশমতো জীবনযাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলা হয়। মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইহজগতে সৎ ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে পরজগতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন মানসিকতা প্রকৃতিগতভাবে শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর শয়তান সব সময় মানুষকে অসৎ ও অন্যায় কাজ করার জন্য ওয়াসওয়াসা বা লোভ লালসা জাগায় এবং আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। আমাদের দেশে মানুষ প্রতিনিয়ত অন্যায় কাজ করে থাকে। দুর্নীতি থেকে শুরু করে সর্বস্তরের অপরাধমূলক কাজ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। চাকুরী ক্ষেত্রেও যে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে সেটাও আমরা অনেকেই জানি না। ঘুষ নেয়া হারাম।

ইসলামে ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বা নিষিদ্ধ। হাদিসে এসেছে, রাসুল (স.) ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন।

(তিরমিজি: ১৩৩৬; ইবনে মাজাহ: ২৩১৩) আর যে আল্লাহ কে ভয় করে সে কখনোই ঘুষ গ্রহণ করতে পারে না, প্রদান ও করতে পারে না। যেহেতু চাকুরী ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটা সময়ের চুক্তিতে কাজ করিয়ে মাসিক বেতন দেয়া হয়। তাই সেই নির্দিষ্ট সময় টা সম্পূর্ণ অফিসের কাজের জন্যই সীমাবদ্ধ করা। এ সময়ে কাজ ফেলে নিজের একান্ত কোনো কাজ করা ও বৈধ হবে না। অফিসের মালিকের আদেশ ছাড়া সময়ের পরে ও আগেও স্থান ত্যাগ করা যাবে না। তাতে তার পুরো বেতন হালাল বলে বিবেচিত হবে না। কাজে ফাকি দেয়ার অপরাধে গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে।

আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ কে ভয় পায় সে কখনোই এরূপ করতে পারে না। কাজেই চাকুরী ক্ষেত্রেও তাকওয়াকে অবলম্বন করতে হবে।

তাকওয়ার ফজিলত

তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর ভয়কে বুঝানো হয়েছে। ভয় করার নির্দেশ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করাও ইবাদাত। তাকওয়া বা আল্লাহর ভীতি যেহেতু ইবাদাত। তাই তাকওয়া অবলম্বনে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত।

০ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এরূপ গুণের অধিকারীর জন্য রয়েছে পুরস্কার। আল্লাহ বলেন-এ পুরস্কার তাদের জন্যই যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।

(সূরা ইবরাহিম : আয়াত ১৪)

০ মানুষের মনের ভয়ই আল্লাহ আশা করেন। বাহ্যিক কোনো ইবাদাতই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। যা মানুষ মুখে আল্লাহর জন্য করে বলে ঘোষণা দেয়। আল্লাহ বলেন, পশুর গোশত, রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া।

(সূরা হজ : আয়াত ৩৭)

০ তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ের ফজিলতে হজরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের কুরবানি সম্পর্কে কুরআনে এসেছে- হে নবি! আপনি তাদেরকে আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরোপুরি শুনিয়ে দিন। তারা দু'জনেই কুরবানি করল, তখন তাদের একজনের কুরবানি কবুল করা হলো আর আরেক জনেরটা কবুল করা হলো না। সে বলল আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে (যার কুরবানি কবুল করা হয় সে) বলল, আল্লাহ শুধুমাত্র মুত্তাকিদের তথা তাঁকে ভয়কারীদের মানও কবুল করে থাকেন। (সূরা মায়িদা : আয়াত ২৭)

০ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে কল্যাণের ঘোষণা। আল্লাহ বলেন, ‘যদি তারা ঈমান আনতো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলতো (পরহেজগার হতো), তবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে অধিক কল্যাণকর প্রতিদান পেত। যদি তারা জানতো।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত ১০৩)

দুনিয়ার প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত। কারণ একদিন তাঁর কাছে প্রত্যেকটি কাজের জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পরিপূর্ণ তাকওয়াবান হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তাকওয়ার পুরস্কার জান্নাত

তাকওয়া জান্নাত লাভের একটি সুপথ। এ পথ অবলম্বন না করে কোনো মুমিন জান্নাতের আশা করতে পারে না। তাকওয়া অর্জন সহজ কাজ নয়। পার্থিব জীবনের হিংসা, লোভ, দুনিয়া বিমুখতাসহ অসংখ্য প্রবৃত্তির খাহেশকে পাড়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। নিজের দেহ ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত রাখতে হবে। যেখানে আত্মশুদ্ধির দাবি সেখানে পাপের অবস্থান থাকতে পারবে না। আমল ও ইখলাস দুটিই একসঙ্গে থাকতে হবে। যার মধ্যে আমল ও ইখলাসের সমাবেশ ঘটবে সেই হবে মুত্তাকি। ইখলাস-একনিষ্ঠতা ছাড়া শুধু আমল দিয়ে মুত্তাকি হতে পারে না। কেবল দাড়ি-টুপি ও নামাজি হয়ে মুত্তাকি হওয়া যায় না। তাই এসব আমলের পাশাপাশি

ব্যক্তিকে অবশ্যই ইখলাসপূর্ণ হতে হবে। আর তখনই এ তাকওয়া মুমিনের জন্য জান্নাত লাভের গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাধারণত তাকওয়াবান ব্যক্তিই আল্লাহর বেশি প্রিয় বান্দা হন। কারণ, তারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলেন। জীবনের কোনো অংশে তারা সামান্যতম অপরাধ করতে সাহস করেন না। এটাই হলো তাকওয়ার বাস্তবতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। (সূরা হুজরাত: ১৩)

কোনো মুমিন নিজেকে শুধু ঈমানদার দাবি করা বা সুন্নিয়তের ধারক-বাহক দাবি করাই মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তার অন্তরে আল্লাহভীতি কতটুকু আছে তা দেখার বিষয়। যদি তার অন্তর ইখলাসে পূর্ণ হয় তখন সে আল্লাহর নিকট মুত্তাকি হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় সে হবে তাকওয়াহীন বান্দা। তাই ইখলাসবিহীন আমল আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। সুতরাং আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ইখলাস। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে। (মুসলিম: ৬৭০৮)

আর তাকওয়া বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হলো হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু ব্যবহার। তবে হারাম খাদ্যই তাকওয়ার পথে বড় বাধা। যে মুমিন খাবার গ্রহণে হারাম-হালাল পার্থক্য করে চলবে না, সে কখনো কামিল মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন সম্ভব হবে না। কেননা, তাকওয়া আর হারাম একই দেহের একই অন্তরে অবস্থান করা অসম্ভব। যার দেহ হারাম খাদ্যে দূষিত সে দেহের পক্ষে আত্মার শুভ্রতা অর্জন করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তাই তাকওয়া অর্জনে হারাম বা সন্দেহযুক্ত যেকোনো খাবার ও বস্তুকে পরিহার করে চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা হালাল পবিত্র বস্তু আহার করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (সূরা মায়েদা: ৮৮)

যে ব্যক্তি তাকওয়াবান আল্লাহ কে ভয় করে তার প্রতিটা কদম চলে তার পরিণাম জান্নাত না হয়ে আর কিই বা হতে পারে..

নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব

নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় তাকওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাকওয়া সকল সৎগুণের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোরূপ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা পরিহার করেন।

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। ফলে মুত্তাকিগণ সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। সে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না। ফলে তার দ্বারা সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটে।

বস্তুত তাকওয়া হলো মহৎ চারিত্রিক গুণ। নৈতিক চরিত্র গঠনে এর কোনো বিকল্প নেই।

তাকওয়া মুমিনের সম্বল

তাকওয়া হচ্ছে মুমিনের সম্বল, আখিরাতের সফরের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। যার মাঝে তাকওয়া নেই, সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। কারণ, তাকওয়ার বদৌলতেই মানুষ ফুরকান (ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী গুণ) লাভ করে। তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর ভালো কাজে উৎসাহী করে। তাকওয়া মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য, পাথেয় লাভের পথ। তাকওয়া মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, জাহান্নামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই যার সম্বল আছে সে কখনোই হাত ফাকা হতে পারে না। আখিরাতেই সে তার সম্বল সাথে নিয়ে যেতে পারবে।

উপসংহার

“যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়,

তারা কভু পথ ভুলে যায় না”

যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে সে জানে তার পথ কোথায়। তার থামতে হবে কোথায়। তারা তাদের পথ কখনোই ভুলে যায় না। আল্লাহকে ভয় করে হারাম-হালাল বেছে চলে। সৎ কাজে আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। চলতে পথে ভুল হলেও পরে সাথে সাথে তওবা করে ফিরে আসে। আর এটাই তো তাকওয়া। দুটো হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে নতজানু হয়ে ওঠে। আল্লাহ কে অনেক ভয় করে। আল্লাহ ছাড়া অন্তরে আর কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না। প্রতি টা কার্যক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলে। একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফল।

আমাদের প্রতিটা দিন তাকওয়ায় ঘেরা থাকুক হোক কুরআন সুন্নাহকে কে আকড়ে ধরে।

“তাকওয়ায় মোড়া থাক আমাদের দিন,
কুরআনের রঙে হোক জীবন রঙিন”

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111540864/>